গবেষণা সিরিজ-১১

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোনটি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী
যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোনটি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০১
২য় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৪
৩য় সংস্করণ : আগষ্ট ২০০৭
৪র্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার কম্পিউটার
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎস – ৭
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে ১৪
৪. মূল বিষয় ১৬
৫. আইন প্রণেতার জ্ঞানের বিস্তৃতি ১৮
৬. আইন প্রণেতার সংখ্যা ২০
৭. আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতা ২১
৮. আইন প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি ২৩
৯. আইন প্রণেতার স্থায়িত্ব ২৪
১০. আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি ২৫
১১. আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক ২৮
১২.আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ৩১
১৩.মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে আইনের বিস্তৃতি ও আনুপাতিক হার ৩২
১৪. আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে এমন কোন কিছুর অনুমতি না থাকা ৩৩
১৫. প্রণীত আইনসমূহ, তা মানা বা না মানার নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও পরিণাম সকলকে জানানোর ব্যবস্থা থাকা ৩৪
১৬. আইন মানা বা না মানার নিখুঁত নিরীক্ষণ পদ্ধতি ৩৬
১৭. বিচার ব্যবস্থার স্তর ৪২
১৮. বিচারকের বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ততা ৪৫
১৯. জনগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা বিচারের সময় বিবেচনায় আনা ৪৫
২০.ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার উপস্থিতি ও ধরন ৪৭
২১.দুনিয়ার বিচারে শাস্তির উপস্থিতি ও ধরন ৪৯
২২.শাস্তি থেকে কেউ রেহাই না পায় তার নিশ্চয়তা থাকা ৫২
২৩.পুরস্কারের উপস্থিতি ও ধরন ৫৩
২৪.শেষ কথা ৫৩

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُوْلٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

www.pathagar.com

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

www.pathagar.com

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৭.০৪.২০০১ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে! এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য

www.pathagar.com

আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

www.pathagar.com

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

www.pathagar.com

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ্ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের

www.pathagar.com

কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।
বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

www.pathagar.com

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

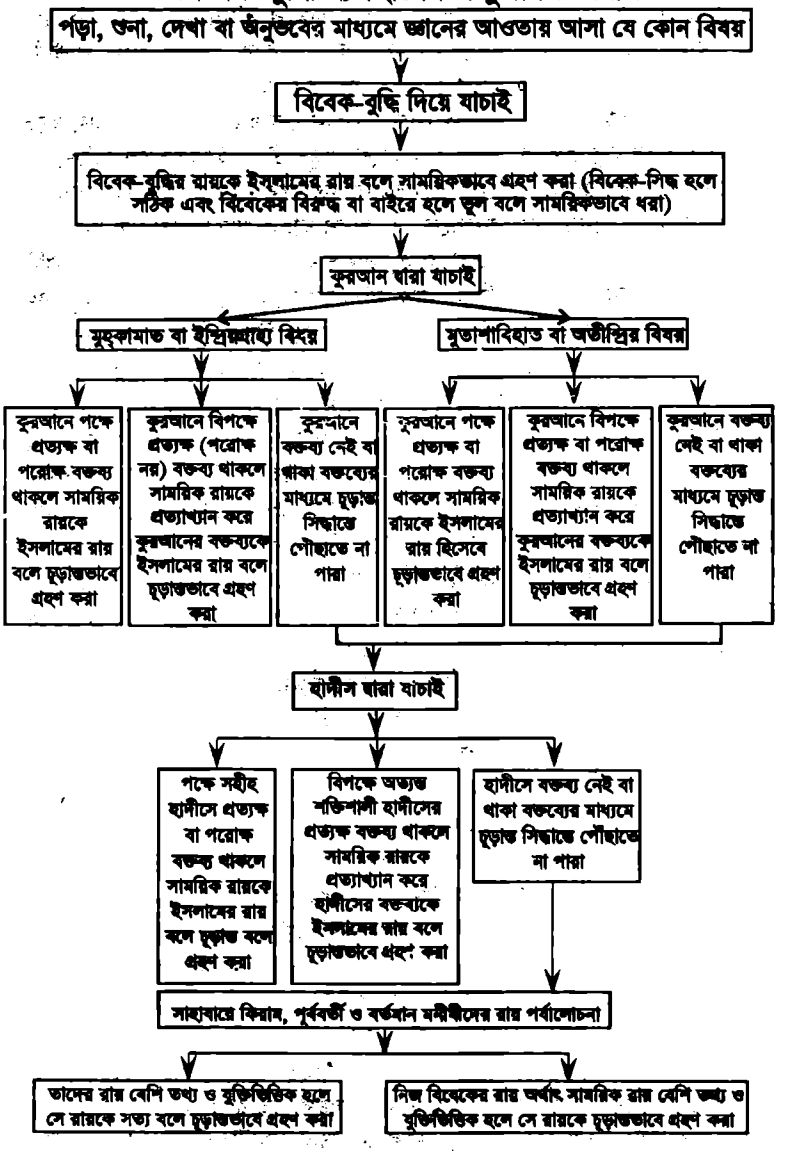

www.pathagar.com

আইন হচ্ছে ঐ সকল বিধান, যা মানুব মেনে চলে বা অনুসরণ করে জীবনকে শান্তিময় করার জন্যে। বর্তমান বিশ্ব মানবতার সামনে দু'ধরনের আইন উপস্থিত আছে- মানুষ রচিত আইন ও কুরআনের আইন। আর ২/১টি বাদে পৃথিবীর সকল দেশে মানুষ রচিত আইন চালু আছে। আর ঐ ২/১টি দেশেও আংশিকভাবে কুরআনের আইন চালু আছে। কোন দেশে একটি আইন চালু হতে বা থাকতে পারে শুধু তখনই, যখন অধিকাংশ মানুষ ঐ আইনের পক্ষে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখে। তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছে যে, মানুষ রচিত আইন, তাদের জীবনকে শান্তিময় করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ রচিত আইন কি মানুষকে শান্তি দিতে পারছে? অন্য কথায় বর্তমান বিশ্ব মানবতা মানুষ রচিত আইন অনুসরণ করে কি তাদের কাঙ্ক্ষিত শান্তি পাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা যদি মানুষকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে এবং তার উত্তর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাই, তবে তা যেমন সম্ভব হবে না তেমন তা সঠিকও হবে না। কারণ, শান্তি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয়। একজনের যেটি শান্তি মনে হবে অন্যজনের নিকট তা অশান্তি মনে হতে পারে সকলের নিকট একই বিষয় শান্তি ময় বা দুঃখময় মনে হতে পারে না। তাছাড়া প্রশ্নমালার ভিত্তিতে, মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে আছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হলে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন অসংখ্যভাবে তৈরি করতে হবে। তারপর প্রতিটি মানুষের নিকট থেকে সেই অসংখ্য প্রশ্নের ব্যাপারে তাদের মন থেকে দেয়া উত্তর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা করতে হবে। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই কোন আইন মেনে মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে থাকবে কিনা বা শান্তি পাবে কিনা, তা পর্যালোচনা করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ঐ আইনকে কিছু মানদণ্ডের (Standard) ভিত্তিতে যাচাই করা। মানদণ্ডগুলো এমন হতে হবে যেন সকল মানুষের বিবেক নির্দ্বিধায় বলে দেয়, কোনো আইন মানুষকে শান্তি দিতে হলে তাকে অবশ্যই ঐ সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিগ্রাহ্য কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানুষ রচিত আইন ও কুরআনের আইনকে যাচাই করে দেখা। সে যাচাইয়ে যদি দেখা যায়, কুরআনের আইন সকল মানদণ্ডে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা মোটেই পারে না, তবে জোর দিয়েই বলা যাবে যে, কুরআনের আইন সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর এবং মানুষ রচিত আইন তা নয়। অর্থাৎ কুরআনের আইন মানুষকে আইন মানার মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত সার্বিক শান্তি দিতে পারবে কিন্তু মানুষ রচিত আইনের পক্ষে সেই শান্তি দেয়া অসম্ভব। আর তখন পৃথিবীর সকল নিষ্ঠাবান মুসলমান, যারা চান তাদের দেশে বা সমস্ত পৃথিবীতে কুরআনের আইন

www.pathagar.com

চালু হওয়ার মাধ্যমে তারাসহ পৃথিবীর সকল মানুষ সার্বিক শান্তিতে জীবন-যাপন করুক, তাদের দায়িত্ব হবে ঐ তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। কারণ বিবেকবান যারাই ঐ সাধারণ বিবেকসম্মত তথ্যগুলো জানতে পারবেন, তাদের মধ্যে সবাই না হলেও অধিকাংশই কুরআনের আইনের যৌক্তিকতা মানতে বাধ্য হবেন এবং এদের মধ্যে যারা সমাজের সার্বিক শান্তির কথা চিন্তা বা কামনা করেন তাদের অনেকেই কুরআনের আইন সমাজে চালু করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আইন যাচাইয়ের সাধারণ মানদণ্ড

প্রথমে চলুন কিছু সহজ বোধগম্য মানদণ্ড স্থির করা যাক। যার ভিত্তিতে যাচাই করে সহজেই বুঝা যাবে একটি আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিনা–

১. আইন প্রণেতার জ্ঞানের বিস্তৃতি :
   ক. বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতি এবং
   খ. স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি,
২. আইন প্রণেতার সংখ্যা,
৩. আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতা,
৪. আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি,
৫. আইন প্রণেতার স্থায়িত্ব,
৬. আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি,
৭. আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক,
৮. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা,
৯. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার,
১০. আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোন কিছুর অনুমতি না থাকা,
১১. প্রণীত আইনসমূহ এবং তা মানা বা না মানার নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও পরিণাম সকলকে জানানোর ব্যবস্থা,
১২. আইন মানা বা না মানার নিখুঁত নিরীক্ষণ (Monitoring) পদ্ধতি,
১৩. নিখুঁত বিচার ব্যস্থার উপস্থিতি ও তার স্তরসমূহ,
১৪. বিচারকের বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ততা,
১৫. জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় আনা,
১৬. ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার উপস্থিতি ও ধরন,
১৭. শাস্তির উপস্থিতি ও ধরন,
১৮. পুরস্কারের উপস্থিতি ও ধরন এবং
১৯. দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি।

www.pathagar.com

এবার চলুন, উল্লিখিত মানদণ্ডগুলোর ভিত্তিতে যাচাই করে দেখা যাক, কোন্ আইন যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর–

১/ক. আইন প্রণেতার জ্ঞানের বিষয় (Subject) ভিত্তিক বিস্তৃতি

যে সত্তা বা সংস্থা মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করবেন, তাকে নিম্নের বিষয়সমূহের পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকতে হবে-

ক. মানুষের এনাটমি (Anatomy), ফিজিওলজি (Physiology), মানসিক (Pschycology), স্বভাব (Behavior), আবেগ-অনুভূতি (Emotion) রোগবিদ্য (Pathology), রোগ চিকিৎসা (Desease treatment) ইত্যাদি সকল বিষয়।

খ. পৃথিবী ও মহাকাশে যত কিছু আছে অর্থাৎ যা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কাজে লাগে বা মানুষকে প্রভাবিত করে, তার সকল কিছু বা সকল বিষয়।

যে সত্তার উপরোক্ত বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান নেই, তিনি কখনই মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বাস্থ্য, দেশ পরিচালনা এবং মহাবিশ্বে উপস্থিত সকল বস্তুর ব্যবহার করা না করা নিয়ে এমন কোন আইন বানাতে পারবেন না, যা মানুষের জন্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে।

এ মানদণ্ডের নিরিখে মানুষ রচিত আইন ও কুরআনের আইনের অবস্থন হচ্ছে–

মানুষ রচিত আইন

মানব সমাজের কোন ব্যক্তি বা সংস্থার (Parliament, Sente ইত্যাদি) উপরোক্ত সকল বিষয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকা অসম্ভব। আর পৃথিবীর কেউ তা দাবিও করে না। এ জন্যই বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের আবিষ্কৃত অসংখ্য তত্ত্ব (Theory) যেমন কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়, তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্র শাসনে মানুষের তৈরি বিভিন্ন আইনকেও কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়। আর এটি পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ জন্যে একই দেশের মানুষ যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়, তেমনি বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়। এটি কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ একই কাজ করে একটি দেশের বিভিন্ন সময়ের মানুষ বা বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে পুরস্কার (শান্তি), বা কষ্ট (শাস্তি) প্রাপ্ত হবে, এটি যুক্তিসঙ্গত নয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতির ব্যাপারে তাঁর অবস্থান কোথায়, তা অসংখ্যবার নানাভাবে আল-কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কয়েকটি বক্তব্য হচ্ছে-

www.pathagar.com

❑ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ: মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ (কুরআনের আইনের প্রণেতা) জানেন। (আর) সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আছে। (হুজরাত : ১৬)

❑ وَاللّٰهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: আল্লাহ উদারহস্ত এবং সর্বঅভিজ্ঞ। (বাকারা : ২৬১)

আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা: কুরাআনের আইনের প্রণেতার সকল বিষয়ের জ্ঞান আছে বা তিনি সর্বভিজ্ঞ কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সকল কিছুর নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান এবং অন্য সকল খবর রাখেন। এ বিষয়ে আরো অসংখ্য আয়াত আল-কুরআনে আছে।

সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষের আইন তা নয়। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কুরআনের আইন বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে জীবনের সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে পারবে। কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা কখনই পারবে না।

১/খ. আইন প্রণেতার জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি

আইন প্রণয়নকারী সত্তার পূর্বোল্লেখিত সকল বিষয়ের তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের অতীতে কী অবস্থা ছিলো, বর্তমানে কী অবস্থা আছে এবং ভবিষ্যতে কী অবস্থা হবে তার পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আইন প্রণেতার দুর্বলতা থাকলেও তার বানানো আইন কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে বাধ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানুষ রচিত আইন

মানব সমাজের কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সকল বিষয়ের তো দূরের কথা কোনো একটি বিষয়েও তিন কালের পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই তার পক্ষে কোনো বিষয়ে এমন কোনো আইন বানানো সম্ভব নয়, যা চিরকাল চলবে। মানুষের আইন প্রণেতার এ দুর্বলতার জন্যেও বিভিন্ন সময়ের মানুষ বিভিন্ন আইন দ্বারা শাসিত হবে বা হয়, যা যুক্তিসঙ্গত নয়।

কুরআনের আইন

জ্ঞানের স্থান-কালের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের প্রণেতা জানাচ্ছেন–

❑ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَاخَلْفَهُمْ.

অর্থ: (কুরআনের আইনের প্রণেতা) তাদের সম্মুখের (বর্তমান বা ভবিষ্যতের) ও পিছনের সকল কিছুই জানেন। (বাকারা : ২৫৫)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই জানেন। অর্থাৎ তাঁর তিন কালের জ্ঞান আছে।

❑ পূর্বে উল্লেখিত সূরা হুজরাতের ১৬ নং, সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে এবং কুরআনের এরকম আরো অনেক জায়গায় যেখানে আল্লাহ তাঁর সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকার কথা জানিয়েছেন, সেখানে কালের বিষয়টি নির্দিষ্ট না করে উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। অর্থাৎ সেখানে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ঐ সকল ব্যাপারে তাঁর তিন কালেরই জ্ঞান আছে।

তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা মহান আল্লাহর পক্ষেই শুধু সম্ভব সকল জিনিসের তিন কালের জ্ঞান পর্যালোচনা করে এমন আইন বানানো, যার দ্বারা সকল কালের মানুষ সমান ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষ রচিত আইন মোটেই যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর নয় কিন্তু কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

২. আইন প্রণেতার সংখ্যা

আইন প্রণেতা একক সত্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বাধীন চিন্তাধারা সম্বলিত বিভিন্ন সত্তা যদি আইন বানাতে বসে, তবে সবাই সম্পূর্ণ একমত হয়ে সকল আইন কখনই তৈরি করতে পারবে না। আর যদি বেশির ভাগ সত্তার মত অনুযায়ী কোন আইন বানানো হয়, তবে যারা ঐ আইনের পক্ষে নয় তারা ১০০% আন্তরিকতাসহকারে ঐ আইন বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করবে না অথবা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ আইনের বিপক্ষে কাজ করবে। এ অবস্থা যদি কোনো মৌলিক আইনের ব্যাপারে হয়, তবে তার দ্বারা মানুষের জীবন অশান্তি ময় হতে বাধ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনের প্রণেতারা (পার্লামেন্ট, সিনেট, আইন পরিষদ সদস্য ইত্যাদি) একের অধিক দল ও সংখ্যার হয় এবং তাদের সকলেরই স্বাধীন চিন্তাধারা ও কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। তাই কোন দেশের সকল আইন প্রণেতা ১০০% একমত হয়ে ঐ দেশের আইন প্রণয়ন করেছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ফলস্বরূপ দেখা যায়, অনেক মৌলিক আইনের বাস্তবায়নের ব্যাপারেও বিরোধী সদস্যরা নানা ধরনের অসহযোগিতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি মানুষ রচিত আইন পরিপূর্ণ শান্তি দেয়ার পথে একটি বিরাট বাধা।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের সংখ্যার ব্যাপারে বলেছেন-

❑ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

www.pathagar.com

অর্থ: বলে দাও তিনি আল্লাহ এক এবং একক। (ইখলাস : ১)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এক এবং একক। অর্থাৎ আইন বানানো, সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি সকল ব্যাপারে তিনি একক। অন্য কারো এ বিষয়ে অংশীদারত্ব নেই।

❑ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেয়ার ক্ষমতা নেই। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

ব্যাখ্যা: যেটি হুকুম সেটিই আইন। আবার যেটি আইন সেটিই হুকুম। তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আইন বানানোর সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই। অর্থাৎ তিনি একাই সব আইন তৈরি করেন। কারণ মানুষের জন্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে এমন আইন বানানোর জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় নিখুঁত জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। আর এ জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার জন্যে দরকারি সকল আইন প্রণয়ন করে তা কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সে আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে একজন প্রতিনিধিও (মুহাম্মাদ সা.) পাঠিয়েছেন। তিনি নিখুঁতভাবে ঐ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েও দিয়ে গেছেন। আর কুরআনে তিনি নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন, মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রথম স্তরের মৌলিক তথ্য মূল আইনগুলো।

কুরআনের আইনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার আইন বানানোর ব্যাপারে শুধু এতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্ট আইন নেই, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্যান্য আইনের আলোকে তারা আইন বানাতে পারবে। ঐ সকল বিষয় হচ্ছে অমৌলিক বা ছোটখাট বিষয়। আর আইন তৈরির ব্যাপারে এ ক্ষমতাটুকু আল্লাহ এ জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন যে, ঐ ধরনের আইনে যদি কিছু ভুলও থাকে, তবে তাতে মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হওয়ার পথে তেমন কোন বাধা সৃষ্টি হবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইন প্রণেতার সংখ্যার দিক দিয়ে কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

৩. আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতা

প্রণীত আইন সবার জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর হতে হলে আইন প্রণেতাকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ১০০% নিরপেক্ষ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী ও দেশের পরিচয়ের উর্ধ্বে হতে হবে। তা না হলে যে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী বা দেশে আইন প্রণেতার অবস্থান, আইন বানানোর সময় মনের অজান্তেই, তার প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে। এ দৃষ্টিকোণের আলোকে উভয় আইনের অবস্থান হলো–

www.pathagar.com

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনের প্রণেতা একজন মানুষ বা অনেক ক'জন মানুষের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংস্থা। একজন মানুষ কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী বা দেশের অবশ্যই হবে। তাই মানুষের দ্বারা তৈরি আইন কখনই ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ১০০% নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই তো দেখা যায়-

ক. ধনিক শ্রেণীর তৈরি আইন ধনীদের জন্যে যেমন কল্যাণকর, গরিবদের জন্যে তেমন নয়।

খ. বঞ্চিত শ্রেণীর তৈরি আইন (সমাজতান্ত্রিক আইন), ধনীদের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর নয়।

গ. এক দেশের লোকদের বানানো আইন অন্য দেশের লোকদের জন্যে ক্ষতিকর।

ঘ. সাদা রং এর মানুষের তৈরি আইন, কালো রং এর মানুষের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর নয়।

ঙ. রাজবংশের তৈরি আইনে রাজবংশের লোকদের এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকেই।

চ. পুরুষের তৈরি আইন নারীদের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর নয় এবং নারীরা আইন তৈরি করলেও তা পুরুষের প্রতি সমান কল্যাণকর হবে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর নিরপেক্ষতার ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ-

❑ لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُوْلَدْ.

অর্থ: তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারো সন্তানও নন। (সূরা ইখলাস:৩)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কারো মা-বাবা নন বা তাঁরও কোনো মা-বাবা নেই। অর্থাৎ এখানে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বংশ, গোত্র বা আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আর যেহেতু তিনি কোথাও জন্মাননি তাই জন্মগতভাবে তিনি কোনো দেশের নাগরিকও নন। আর তিনি যেহেতু কারো জন্মানো নন বা কাউকে জন্মও দেন না, তাই তিনি পুরুষ ও মহিলা কোনটিই নন।

❑ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَّلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

www.pathagar.com

অর্থ: তিনি (কুরআনের আইনের প্রণেতা) সকল কিছুর (অর্থাৎ সকল মানুষ এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য জিনিসের) রব। নিজ অর্জন নয় এমন বিষয় তিনি কারো উপর চাপান না। একজনের বোঝা অন্যজনের ওপর তিনি চাপান না। (আনআম : ১৬৪)

ব্যাখ্যা: রব শব্দটির অনেক অর্থ হয়। তার একটি হচ্ছে কল্যাণ কামনাকারী। কুরআনের আইনের প্রণেতা তাই এখানে প্রথমে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন (লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে থেকে) তিনি সকল মানুষের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকামী। এরপর তিনি তাঁর এই সমানভাবে কল্যাণ কামনার দুটো দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সে দিক দুটো হচ্ছে–

- ❑ একজন মানুষ নিজে যা অর্জন করেছে তা ব্যতীত অন্যকিছু তার ওপর চাপান না এবং
- ❑ একজনের কৃতকর্মের বোঝা তিনি অন্যের ওপর চাপান না।

তাই আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

৪. আইন প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি

আইন প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি হতে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও অধিক। তা না হলে কোনো আইন যদি কোনো এলাকা, দেশ বা পৃথিবীর মানুষের নিজস্ব স্বার্থের বিপরীত হয়, তবে তারা ঐ আইন মানতে চাইবে না এবং ঐ সত্তাকে উৎখাত করে ফেলবে বা ফেলতে চাইবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে–

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্থাৎ সরকারের শক্তি সারা বিশ্বের মানুষের শক্তির থেকে সকল সময় বেশি থাকাতো দূরের কথা, তার দেশের জনগণের শক্তির তুলনায়ও সকল সময় বেশি থাকে না। তাই তো দেখা যায়, মানুষের আইনের সরকার সামরিক বা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়। আর তখন অন্য ধরনের আইন চালু হয়ে যায়।

কুরআনের আইন

শক্তির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রয়োগকারী সত্তার (আল্লাহ) কয়েকটি বক্তব্য হচ্ছে–

❑ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

অর্থ: সকল শক্তি একমাত্র আল্লাহর করায়ত্ত। (বাকারা : ১৬৫)

❑ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: আল্লাহ সকল কিছুর একক বা সম্মিলিত শক্তির চেয়েও অধিক শক্তিশালী। (বাকারা : ২৮৪)

www.pathagar.com

❑ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

অর্থ: তাঁকে (কুরআনের আইনের প্রণেতাকে) তোমরা পৃথিবীতে অক্ষম (উৎখাত) করে দিতে পারবে না। আল্লাহর মুকাবেলায় অন্য কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীও তোমরা পাবে না। (শুরা : ৩১)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা মহান আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তোমরা সকল মানুষ মিলে চেষ্টা করলেও তাঁকে উৎখাত করতে পারবে না। তিনি আরো বলেছেন, তাঁর মুকাবেলায় পৃথিবীর মানুষ অন্য কোনো শক্তি বা সত্তাকে বা সাহায্যকারী হিসেবেও পাবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুরআনের আইনের প্রণেতা ও প্রয়োগকারী সত্তা তাঁর শক্তি যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের চেয়ে বেশি, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর সকল মানুষ একযোগে চেষ্টা করলেও শক্তির মাধ্যমে তাঁকে উৎখাত করতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আইনের প্রণেতা যদি এতোই শক্তিশালী হয়ে থাকেন, তবে তিনি কেন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সকলকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করেন না। এর উত্তর হচ্ছে– কুরআনের আইনের প্রণেতা মানুষকে পরীক্ষা করতে চান, তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করা বা না করার ভিত্তিতে এবং সে পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ইনসাফসহকারে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান। কাউকে কোনো কিছু অনুসরণ করা না করার ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে চাইলে তাকে অবশ্যই তা করা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হয়। এটা একটি অতি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির কথা। তাই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করতে বাধ্য করার মতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরআনের আইন প্রণেতা বাধ্য না হলে তাঁর সে শক্তি প্রয়োগ করেন না। কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি যখন তাঁর আইন অমান্য করতে করতে একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই শুধু তিনি নিজ তৈরি প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে তাঁর সেই শক্তি প্রয়োগ করেন। তবে সে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠী বা জাতিকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করার পরিবর্তে তিনি সাধারণত পৃথিবী থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতিকে তিনি এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন বলে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

৫. আইন প্রণেতার স্থায়িত্ব

আইন প্রণেতাকে হতে হবে চিরস্থায়ী। তা না হলে নতুন আইন প্রণেতা এসে পূর্বের প্রণেতার অনেক আইন অকল্যাণকর, যথেষ্ট কল্যাণকর নয় বা

www.pathagar.com

পছন্দ নয় বলে পাল্টিয়ে ফেলবেন। ফলে বিভিন্ন সময়ের মানুষ একই কাজের জন্যে বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনের প্রণেতা (সরকার) ক্ষণস্থায়ী হয়। আর নতুন সরকার এসে পূর্বের সরকারের অনেক আইন পরিবর্তন করে ফেলে, এটি একটি বাস্তব সত্য। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষ রচিত আইনে বিভিন্ন সময় বা কালের মানুষ একই কাজের জন্যে বা একইভাবে চলার জন্যে সমানভাবে বা মাত্রার কল্যাণ বা শাস্তি না পেয়ে বিভিন্নভাবে বা মাত্রায় কল্যাণ বা শাস্তি পায়, যেটি মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কুরআনের আইন

স্থায়িত্বের ব্যাপারে কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বিভিন্নভাবে, কুরআনের মাধ্যমে। তার একটি হচ্ছে-

❑ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো (সার্বিকভাবে কল্যাণকর) আইন প্রণেতা নেই। তিনি চিরস্থায়ী এবং সব কিছুকে তিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছেন। (বাকারা : ২৫৫)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি চিরস্থায়ী। তাহলে তাঁর বানানো আইনও চিরস্থায়ী হবে।

সুতরাং কুরআনের আইন মেনে চললে পৃথিবীর সকল দেশের সকল সময়ের মানুষ একইভাবে বা একই মাত্রায় কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। আর তা না মেনে চললে সকল দেশের সকল সময়ের মানুষ একইভাবে বা একই মাত্রায় শাস্তি বা কষ্ট পাবে।

তাই আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষের আইন যুক্তিসঙ্গত নয় কিন্তু কুরআনের আইন ১০০% যুক্তিসঙ্গত।

৬. আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি

আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতি শুধু একটি দেশের মধ্যে, শুধু মানুষের মধ্যে বা শুধু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ হলে চলবে না। তা হতে হবে মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে। কারণ-

ক. আইন যদি শুধু একটি দেশের মানুষের ওপর চলে তবে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হবে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ একই কাজের জন্যে বিভিন্নভাবে শাস্তি বা শাস্তি (কষ্ট) পাবে। এটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

খ. পৃথিবীর অন্য যে সকল সৃষ্টি (পশু-পক্ষী, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) আছে তার উপর যদি আইন প্রণেতার আইন বা কর্তৃত্ব না চলে তবে ঐ সকল সৃষ্টির উপর নিশ্চয়ই অন্য প্রণেতার আইন চলবে। সে আইন মানুষের জন্যে প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে ঐ সকল সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে না এসে অকল্যাণেই আসবে। এ রকম হলে মানুষের জীবন মোটেই শান্তিময় হবে না।

গ. মহাকাশে যদি অন্য সত্তার আইন চলে তবে সে আইনও পৃথিবীর মানুষের আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে মহাকাশের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির আচরণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর না হয়ে অকল্যাণকরই হবে। আর তাহলে মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

তাই কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আইন যুক্তিসঙ্গত ও মানুষের জন্যে কল্যাণকর হতে হলে সে বিস্তৃতি হতে হবে মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে এবং অন্য সকল সৃষ্টির জন্যে প্রণীত আইন হতে হবে মানুষের জন্যে প্রণীত আইনের সম্পূরক। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই অন্য সকল সৃষ্টির আইন রচিত হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান নিম্নরূপ-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইন যে দেশে রচিত হয়, সে দেশের মানুষের পরেই শুধু কার্যকর হয়। অর্থাৎ মানুষ রচিত আইনে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইনে শাসিত হয়। তাই ঐ আইনে, একই কাজের জন্যে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে শাস্তি বা কষ্টপ্রাপ্ত হয়। আর মানুষ রচিত আইন মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টির ওপর প্রযোজ্য হবে বা মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি মানুষের কর্তৃত্বের মধ্যে এসে যাবে, এটা কল্পনাও করা যায় না।

কুরআনের আইন

কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নানা ধরনের বক্তব্য কুরআনের আইনের প্রণেতা আল-কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। তার কয়েকটি হচ্ছে-

❑ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج

অর্থ: তার (কুরআনের আইনের প্রণেতার) গদি (ক্ষমতা ও প্রশাসন) পৃথিবী ও মহাকাশ জুড়ে বিস্তৃত। (বাকারা : ২৫৫)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতার বিস্তৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ জুড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকাশে মানুষসহ অন্য যত সৃষ্টি আছে, সে সকল সৃষ্টি জুড়েই হচ্ছে তাঁর আইনের প্রয়োগ স্থলের বিস্তৃতি।

www.pathagar.com

❑ ... ... وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

অর্থঃ ... ... অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর (কুরআনের প্রণেতার) নিকট আত্মসমর্পণ করে আছে এবং সকলকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। (আল-ইমরান : ৮৩)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাঁর কাছে বাধ্যতামূলকভাবে আত্মসমর্পণ করে আছে। অর্থাৎ সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর আইনের অধীন। মানুষের জন্যে এ ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম আছে এবং তাও কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সে ব্যতিক্রম হচ্ছে, কুরআনের আইনের প্রণেতা মানুষের শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Organs) কোষগুলোকে (Cells) অন্য সৃষ্টির ন্যায় বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর আইনের অধীন করে রেখেছেন। সে আইন ভাঙলেই রোগ অর্থাৎ শারীরিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে তা করেননি। কারণ, প্রণীত আইন মানা না মানার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে তিনি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান। তাই, ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে অধীন করে দিলে সেটি করার যৌক্তিকতা থাকে না। মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে অধীন করা হয়নি এবং ইচ্ছা শক্তিকে যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করলে মানুষ যে দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তিতে থাকবে, তা তিনি বিভিন্নভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُوْرًا.

অর্থঃ আমি তাদেরকে (মানুষকে) জীবন চলার পথ জানিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে তারা (সে পথে চলে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে) শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তারা সে পথে চলা অস্বীকার করতে পারে। (দাহর : ৩)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে বলে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের জীবন কল্যাণকরভাবে পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল আইন প্রণয়ন করে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে আইন মানা না মানার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্য করেননি। তাই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর দেয়া আইন মেনে চলে কল্যাণ বা শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। অথবা তাঁর দেয়া আইন অমান্য করে দুনিয়া ও আখেরাতে অশান্তিতে থাকতে পারে।
অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى ... ...

অর্থঃ আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে ঐ সকল লোককে তাঁর দেয়া হেদায়েত অনুযায়ী চলতে বাধ্য করতে পারতেন ... ... (আনআম : ৩৫)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: এখানে কুরআনের আইনের প্রণেতা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যদি চাইতেন তবে মানুষের মধ্যে যারা তাঁর আইন মানতে চায় না, তাদের সকলকে বাধ্য করতে পারতেন তাঁর আইন মেনে চলার জন্যে।

কুরআনের আইনের প্রণেতার কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতির ব্যাপারে উপরোক্ত কথাগুলো যে বাস্তব সত্য, তার প্রমাণ হচ্ছে-

ক. মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি কুরআনের আইন প্রণেতার বানানো প্রাকৃতিক আইন মেনে চলছে তাই সেখানে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ বা অশান্তি নেই।

খ. মহাকাশ ও পৃথিবীর (মানুষ বাদে) সব সৃষ্টির জন্যে তৈরি প্রাকৃতিক আইনগুলো এমন যে, ঐ সব সৃষ্টির দ্বারা মানুষের কোনো না কোনো কল্যাণ হয়।

গ. অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ঘ. মানুষের শরীরের কোষগুলো (Cells) আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক আইন (Naturel Law) মেনে চলতে বাধ্য। সে আইনের কোনো ব্যতিক্রম হলেই কোষগুলোর মধ্যকার শান্তি নষ্ট হয় এবং তখন অশান্তি অর্থাৎ রোগের সৃষ্টি হয়।

ঙ. মানুষের চিন্তা-শক্তি ও সে চিন্তা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষ কুরআনের আইন ইচ্ছা করলে মানতে আবার ইচ্ছা করলে অমান্য করতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

৭. আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হতে হবে আইন প্রণেতার প্রতি ১০০% আনুগত্যশীল। অর্থাৎ তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাধারা ও ক্ষমতা থাকবে না। তা থাকলে কোন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন কোন আইন সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করবেই। আর যারা দ্বিমত পোষণ করবে, তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আইন বাস্তবায়নের চেষ্টাতো করবেই না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ফলে ঐ আইন তার প্রণেতার ইচ্ছা অনুযায়ী ১০০% শান্তি দিতে পারবে না। এ অবস্থা যেকোন আইন কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে একটা বিরাট বাধা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে-

www.pathagar.com

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানুষ এবং তাদের সকলের স্বাধীন চিন্তাধারা ও কিছু না কিছু ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা আছে। তাই সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ সরকারের প্রতি মনেপ্রাণে ১০০% আনুগত্যশীল হওয়া অসম্ভব। এ জন্যে একটি সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সকল আইন বাস্তবায়নের জন্যে মনেপ্রাণে সর্বতভাবে চেষ্টা করবে এমনটি হওয়া অসম্ভব। বরং অনেকে আইন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ হচ্ছে দু'ধরনের- মানুষ ও ফেরেশতা। মানুষের দায়িত্ব শুধু দুনিয়ায় আর ফেরেশতাদের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে।

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশ বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্তরা মানুষ হলেও তাদেরকে প্রথমে ঈমান আনার মাধ্যমে কুরআনের আইন প্রণেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার ঘোষণা দিতে হয়। অর্থাৎ তাদের সকলকে ঘোষণা দিতে হয়, কুরআনের আইন প্রণীত সকল আইন মানা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে তারা মনেপ্রাণে সর্বতভাবে চেষ্টা করবে। আর ঈমানের দাবি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিরা সবাই মনেপ্রাণে এটাও বিশ্বাস করে যে, তাদের সকল কাজ নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর পর সেই নিরীক্ষণ পর্যালোচনা করে নিখুঁত পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। তাই মানুষ হওয়ার জন্যে স্বাভাবিকভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি হলেও মানুষের আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তুলনায় তারা বেশি আনুগত্যশীল ও দায়িত্বশীল হবেন, এটাই যুক্তিসঙ্গত। যারা মুনাফিক (মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে নয়) তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তবে এই মুনাফিকদের নিকৃষ্টতম দোযখে যেতে হবে এ ঘোষণা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন।

কুরআনের আইনের দুনিয়া ও পরকালের অংশ বাস্তবায়নের জন্যে ঐ আইন প্রণেতার অন্য যে সৃষ্টি আছে, তার নাম ফেরেশতা। ঐ ফেরেশতাদের অবস্থা সম্বন্ধে কুরআনের আইন প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাধারা বা ক্ষমতা নেই এবং তাদের মানুষের মত খাওয়া-দাওয়া, প্রস্রাব-পায়খানা, ক্লান্তি, বিশ্রাম, ঘুম, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি নেই। সারাক্ষণ কুরআনের আইন প্রণেতার আনুগত্যশীল থাকা এবং যে কাজ তাদের যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সে কাজ সেভাবে করা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কথাগুলো কুরআনের আইনের প্রণেতা আল-কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ তারা (ফেরেশতারা) রাত্র ও দিন সারাক্ষণ আল্লাহর তাসবীহে (অর্থাৎ আনুগত্য প্রকাশক কথা ও কাজে) লিপ্ত। কখনও তারা ক্লান্ত হয় না।

(আম্বিয়া : ২০)

জাহান্নামে কর্মরত ফেরেশতাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন-

عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থঃ সেখানে (জাহান্নামে) অত্যন্ত কর্কশ, রূঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনই আল্লাহর হুকুম অমান্য করবে না এবং যে হুকুমই তাদের দেয়া হবে, তারা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।(তাহরীম : ৬)

পরকালের জগতে সকল কাজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে কুরআনের আইন প্রণেতার এই ফেরেশতা কর্মচারীরা। আর দুনিয়ায় ঐ ফেরেশতা কর্মচারীদের কিছু কাজ হচ্ছে-

ক. মানুষ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তারা মানুষের কল্যাণে আসে।

খ. মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা এবং সে নিরীক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

গ. আল্লাহর তৈরি করে দেয়া প্রাকৃতিক ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন অমান্য করার দরুন যে বিপদ মানুষের উপর আসার কথা, তার অনেকটিকে ঘটতে না দেয়া। এ কথাটা আল-কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে-

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ.

অর্থঃ এবং যে বিপদ তোমাদের ওপর আসে তা সবই তোমাদের নিজ হাতে (নিজেদের কুরআনের আইন অমান্যকারি কার্যকলাপের দ্বারা) তৈরি এবং অনেক বিপদ (যা তোমাদের কার্যকলাপের জন্যে ঘটার কথা ছিলো) তিনি (আল্লাহ্) ঘটতে দেন না। (আস-শুরা : ৩০)

ঘ. আইন অমান্য করতে করতে সীমা অতিক্রম করে গেলে কখনও কখনও কোন জনগোষ্ঠী বা জাতিকে শাস্তি দেয়া বা ধ্বংস করে দেয়া।

ঙ. শত্রুদের দ্বারা আইন মান্যকারীদের ওপর অতিমাত্রায় বিপদ আসলে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করা।

ফেরেশতারা ঐ সকল কাজ করে আল্লাহর নির্দেশে। তবে সে নির্দেশ মহান আল্লাহ কিভাবে দেন, দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, সে বিষয় নিয়ে মুসলমান জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা চালু আছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে (কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' এবং 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বই দু'টিতে)।

তাহলে আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

৮. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা

আইনের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। তা না হলে ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ থেকে তারা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবে না। এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থা হচ্ছে-

মানুষ রচিত আইন

মানুষের আইনের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী, দল, মতবাদ বা দেশের অবশ্যই হবে। তাই তাদের পক্ষে ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে, আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই তো কম হোক বা বেশি হোক, পথিবীর সকল দেশে দেখা যায়-

- ❑ এক দল বা মতবাদে বিশ্বাসী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য দল ও মতবাদে বিশ্বাসী জনতার ওপর সমান আচরণ করতে পারে না।
- ❑ এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার দেশের জনগণ ও অন্য দেশের জনগণের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
- ❑ এক লিঙ্গের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
- ❑ এক বর্ণের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একই দেশের বা অন্য দেশের ভিন্ন বর্ণের মানুষের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে পারে না।
- ❑ এক বংশ বা গোত্রের সরকারি কর্মচারীরা অন্য বংশ বা গোত্রের লোকদের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।

আর যেহেতু মানুষের আইনের প্রয়োগ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায়, তাই এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ হওয়ার কোনো সুযোগও থাকে না।

www.pathagar.com

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও মানুষ। কিন্তু ঐ আইনে প্রকৃতভাবে বিশ্বাসী লোকদের মানসিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন তারা লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করার উপযোগী হয়। তারপরও এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না যে, তাদের সকলেই ঐ সকল বিষয়ে ১০০% নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করে। তবে কুরআনের আইনের এ অভাবটা পূরণ হয়ে যাবে তার চূড়ান্ত বিচারের ব্যবস্থায়। ঐ চূড়ান্ত বিচারের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্বে যে কর্মচারীরা (ফেরেশতা) দায়িত্বশীল, তারা মানুষের কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণী, দল, মতবাদ বা দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন। তাই তাদের সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে যে চূড়ান্ত বিচার হবে, সে সময় দুনিয়ার বিচারে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেয়ে থাকে, তা পূরণ করে দেয়া হবে বা পূরণ হয়ে যাবে।

অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষ রচিত আইন থেকে কুরআনের আইন অনেক অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর।

৯. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে আইনের বিস্তৃতি এবং আনুপাতিক হার

আইনের বিস্তৃতি হতে হবে মানুষের জীবনের যতো দিক আছে তার সকল দিকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-সন্ধি, পেশাগত ইত্যাদি সকল দিকে। আর এই সকল দিকের মধ্যে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি নিয়েই পরিবার, সমাজ, দেশ বা পৃথিবী। তাই প্রতিটি ব্যক্তি যদি ভালো হয়ে যায় তবে সমাজ, দেশ বা পৃথিবী ভালো অর্থাৎ কল্যাণময় হতে বাধ্য। আর একজন ব্যক্তি ভালো হয়ে অর্থাৎ কল্যাণময় হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে সব থেকে বড় ভূমিকা রাখে তার পরিবার। জীবনের প্রথম কিছু বছর একটি মানব শিশু তার পরিবারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে। ঐ বছর ক'টিতে যে শিক্ষা সে পায়, সারাটি জীবন সেই শিক্ষার কিছু না কিছু প্রভাব তার উপর অবশ্যই থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনের বিস্তৃতি জীবনের সকল দিকে থাকলেও দেখা যায়, সেখানে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনের থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের দিকে অধিক নজর বা গুরুত্ব দেয়া হয়, যেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ব্যক্তি যদি খারাপ হয়ে গড়ে ওঠে তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব হয়।

www.pathagar.com

কুরআনের আইন

কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে মানুষের জীবনের সকল দিক পরিচালনার জন্যে আইন আছে। সাথে সাথে এটাও দেখা যায়, কুরআনে ব্যক্তি ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে যতো বক্তব্য, আলোচনা বা আইন আছে, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তা নেই। অর্থাৎ কুরআন ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে অন্য সকল দিকের আইন থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

তাই জীবনের বিভিন্ন দিকের আইনের বিস্তৃতি ও তার গুরুত্বের আনুপাতিক হারের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন বেশি যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর।

১০. আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে উৎসাহিত করে এমন কোন কিছুর অনুমতি না থাকা

আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে এমন সকল বিষয় নিষিদ্ধ থাকতে হবে। কারণ, কোনো একটি বিষয় করতে বলার নির্দেশ দেয়া এবং সাথে সাথে সে বিষয়টি অমান্য করতে উৎসাহিত করে এমন কিছু করারও অনুমতি দেয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়। তাই এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা হচ্ছে-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক আইন দেখা যায়, যা পরস্পর বিরোধী। যেমন–

- ধর্ষণ (Rape) করা মানুষ রচিত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু সাথে সাথে সেখানে মানুষের যৌন বাসনাকে জাগিয়ে বা ক্ষেপিয়ে তোলে এমন সকল কিছু যেমন মহিলাদের অর্ধ নগ্ন বেশে চলাফেরা করা, যৌন সুড়সুড়ি দেয় এমন প্রচারণা (পোস্টার, বই, সিনেমা, নাটক, গান ইত্যাদি) আইনসিদ্ধ।
- মদ খেয়ে গাড়ি চালানো বা অসামাজিক কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মদ ইচ্ছামত উৎপাদন করা, বেচাকেনা করা ও খাওয়া সিদ্ধ।
- সকল শিশু বা নাগরিক সৎ, নীতিবান মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক বলে কামনা করা কিন্তু অন্যদিকে ভিডিও গেম্‌স, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে গোলাগুলি, মারামারি, কাটাকাটি, চোরাকারবারী, মানুষ ঠকানো বা ফাঁকি দেয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক প্রচারের অনুমতি দেয়া।

www.pathagar.com

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে ঐ রকম পরস্পর বিরোধী আইন নেই। যেমন-

- ধর্ষণ (Rape) ও জেনা করা কুরআনের আইনে নিষিদ্ধ। তাই সাথে সাথে সেখানে ধর্ষণ ও জেনাকে উৎসাহিত করতে পারে এমন (উপরে বর্ণিত) সকল কিছুও নিষিদ্ধ।
- মদ খাওয়া নিষিদ্ধ। আর সাথে সাথে মদ উৎপাদন করা ও বেচাকেনা করাও সাধারণভাবে নিষিদ্ধ।

তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

১১. প্রণীত আইনসমূহ, তা মানা বা না মানার নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও পরিণাম সকলকে জানানোর ব্যবস্থা

আইন ও তার বিভিন্ন দিক শুধু প্রণয়ন করে রাখলেই চলবে না। বরং আইনগুলো কী, তা মানা বা না মানার বিষয়টি কিভাবে নিরীক্ষণ (Monitoring) করা হবে বা হচ্ছে এবং মানা বা না মানার জন্যে কী ধরনের পুরস্কার বা শাস্তি মিলবে ইত্যাদি বিষয় সকল মানুষ যাতে জানতে পারে বা জানতে বাধ্য হয়, তার সব ধরনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ জানা না থাকলে মানার প্রশ্ন আসে না। আবার জানার ব্যবস্থা না করে, না জানার দরুন কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যদিকে ঐ বিষয়গুলো জানতে পারলে মানুষ আইন মানতে উৎসাহিত হবে এবং অমান্য করতে সাহস পাবে না। এ ব্যাপারে মানুষের ও কুরআনের আইনের অবস্থা হচ্ছে–

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে উপরোক্ত বিষয়গুলো সকল মানুষ যাতে জানতে পারে, তেমন ব্যাপক কোনো ব্যবস্থা সাধারণত নেয়া হয় না বা সকল মানুষের জন্যে তা জানা বাধ্যতামূলক করা হয় না। তাই তো দেখা যায়, মানুষ রচিত আইনে, আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষ ঐ বিষয়গুলো পুরোপুরি অবগত থাকে না। আর আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও তাদের নির্দিষ্ট অংশের (Sub Speciality) আইনগুলোই শুধু ভালো জানে।

কুরআনের আইন

প্রণীত আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় মানুষকে না জানিয়ে আইন অমান্য করার জন্যে শাস্তি দেয়া কুরআনের আইন প্রণেতার নীতি নয়। তথ্যটি পরিষ্কারভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাবে–

তথ্য-১

- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

অর্থ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোন বার্তাবাহক (হক ও বাতিল জানানোর জন্যে) তার নিকট পাঠাই। (বনী-ইসরাইল:১৫)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন কোন উপায়ের (মৌখিক দাওয়াত, পুস্তক, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট, বক্তব্য, আলোচনা, উপদেশ ইত্যাদি) মাধ্যমে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান যার নিকট পৌঁছায় নাই তাকে করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে শাস্তি দেয়া তাঁর বিধান নয়।

❑ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرِيْنَ.

অর্থ: আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (শু'য়ারা : ২০৮)

ব্যাখ্যা: এখানেও আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর কোন জনপদকে তিনি ধ্বংস করেননি যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী ন্যায়-অন্যায় কাজ সম্বন্ধে তাদের উপদেশ তথা জ্ঞান দিয়েছেন।

❑❑ আল-কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায় নাই অর্থাৎ যে কোনভাবে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারেনি, তাকে ইসলাম যথাযথভাবে পালন না করার জন্যে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন না বা তার শাস্তির মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

তথ্য-২

যে ব্যক্তি ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম যথাযথভাবে পালন না করতে পারার কারণে শাস্তি দেয়া আল্লাহর বিধান নয় তা পরোক্ষভাবে বুঝা যায় নিম্নের বিষয়সমূহ হতে–

ক. আল্লাহ্ প্রথম মানুষটিকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কারণ নবী না হলে তিনি জানতে পারতেন না কোনগুলো ইসলমের করণীয় আর কোনগুলো নিষিদ্ধ কাজ।

খ. যুগে যুগে সকল প্রথম স্তরের মৌলিক আইন নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হল আল-কুরআন।

গ. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে বাধ্যতামূলকই শুধু করেননি, তা করা সকলের জন্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা ১ নং কাজ হিসেবে এবং না করা সব থেকে বড় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ কোনটি এবং শয়তানের ১ নং কাজ কোন্‌টি' নামক বইটিতে।

ঘ. কুরআনের জ্ঞান যাতে কোন মুসলমান ভুলতে না পারে তার জন্যে দিনে পাঁচ বার তার কিছু অংশ পড়ার (নামাজের মাধ্যমে) বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

ঙ. আল-কুরআনের তথ্য যার জানা আছে, তার জন্যে অপরকে সে তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করেছেন। আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা কারণে তা অপরকে না জানানোর জন্যে কঠিক শাস্তির ঘোষণা করেছেন।

চ. আল্লাহর কিতাবের আইনগুলো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যা করে ও বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে যুগে যুগে প্রতিনিধি (নবী-রাসূল) পাঠিয়েছেন।

তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

১২. আইন মানা বা না মানার নিখুঁত নিরীক্ষণ (Monitoring) পদ্ধতি

আইন মানা বা না মানার ওপর ভিত্তি করে যদি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে আইন মানা বা না মানার নিরীক্ষণ (Monitoring) অবশ্যই করতে হবে। এটি একটি অনস্বীকার্য বিষয় বলে পৃথিবীর সকল সরকারই তা কোনো না কোনোভাবে করে থাকে। কিন্তু নিরীক্ষণের ভিত্তিতে যদি যুক্তিসঙ্গত, ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ পুরস্কার ও শাস্তি দিতে হয়, তবে সে নিরীক্ষণের নিম্নের গুণাগুণ গুলো অবশ্যই থাকতে হবে-

ক. নিরীক্ষিত হতে হবে সকল মানুষের দিনের বা রাতের প্রকাশ্য বা গোপন সকল কাজ।

খ. মানুষের বাহ্যিক কাজের সাথে সাথে ঐ সময়ে তার মনের অবস্থাও নিরীক্ষণ করতে হবে।

গ. নিরীক্ষণের বাস্তব পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে তার সাহায্যে বিচার করার সময় ভুল বা অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

ঘ. যে সকল কাজের ফলাফল চালু থাকে (আমলে জারিয়া), সে সকল কাজের নিরীক্ষণ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।

চলুন এখন নিরীক্ষণের এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে উভয় আইনের অবস্থান পর্যালোচনা করা যাক–

ক. প্রকাশ্য বা গোপন, দিন বা রাতের সকল কাজের নিরীক্ষণ করা

একজন মানুষের পুরো জীবন নিরীক্ষণ করে যদি যুক্তিভিত্তিক পুরস্কার ও শাস্তি দিতে হয়, তবে তার প্রকাশ্য ও গোপন এবং দিন ও রাতের সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করতে হবে। তা না হলে তার সকল কাজকে মূল্যায়ন করা হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা হচ্ছে–

www.pathagar.com

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে, আইন মানা বা না মানার নিরীক্ষণ করা হয় মানুষ দ্বারা গঠিত সরকারের বিভিন্ন সংস্থার (পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদি) মাধ্যমে। ঐ সকল সংস্থার সদস্যদের দ্বারা একটি দেশের বা সারা বিশ্বের সকল মানুষের প্রকাশ্য বা গোপন, দিন বা রাতের সকল কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই পৃথিবীর কোনো সরকার বা সংস্থা তা করার দাবিও করে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা ঘোষণা করেছেন, তাঁর সরকার মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবে দুটো স্তরে। প্রথম বা সাময়িক স্তর হবে দুনিয়ায়। আর চূড়ান্ত স্তর হবে দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরকালে। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, প্রথম স্তরের বিচারে নিরীক্ষণ ও বিচার করবে মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরের বিচারের জন্যে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করবে তাঁর নিয়োগকৃত কর্মচারীরা অর্থাৎ ফেরেশতারা। আর ঐ স্তরে বিচার করবেন তিনি নিজে।

দুনিয়ার স্তরের নিরীক্ষণ মানুষেরা করবে, তাই কুরআনের আইনে ঐ স্তরের নিরীক্ষণের বিস্তৃতি, মানুষ রচিত আইনের তুলনায় কম হলেও কিছু দুর্বলতা থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের নিরীক্ষণে ঐ দুর্বলতা থাকবে না।

চূড়ান্ত বিচারের তথ্য সংগ্রহের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রণেতার অনেক বক্তব্যের কয়েকটি হচ্ছে–

❑ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحفظِيْنَ. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক (নিরীক্ষক) নিযুক্ত রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক (নিরীক্ষক)। তোমরা যা করছো, তার সব কিছুই তারা জানেন (নিরীক্ষণ করেন)। (ইনফিতার : ১০-১২)

❑ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الأَرْضِ.

অর্থ: জল ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তার সব কিছু জানেন (খবর রাখেন বা নিরীক্ষণ করেন)। গাছের একটি পাতা পড়েছে কিন্তু তিনি তা জানেন না (নিরীক্ষণ করেননি) এমন হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর অন্ধকারচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। (আনআম : ৫৯)

❑ وَاللهُ يَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

অর্থ: অথচ তিনি (কুরআনের আইনের প্রণেতা) তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ই জানেন। (নাহল : ১৯)

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন, দিন ও রাতের সকল কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু মানুষের আইন তা মোটেই নয়।

খ. বাহ্যিক কাজের নিরীক্ষণের সময় মনের অবস্থাও নিরীক্ষণ (Monitoring of motive) করা

একটি কাজের জন্যে কোনো মানুষকে সুবিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে ঐ কাজটি করার সময় তার মনের অবস্থা কী ছিলো তা সঠিকভাবে জানা একান্তভাবেই দরকার। অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে, না দুর্ঘটনাবশত তার দ্বারা কাজটি হয়ে গেছে, তা জানা দরকার। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের পুরস্কার বা শাস্তি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাবশত ঘটে যাওয়া কাজের পুরস্কার বা শাস্তি কখনই সমান হতে পারে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা হচ্ছে–

মানুষ রচিত আইন

মানুষের মনের অবস্থা সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করার মত কোনো প্রযুক্তি এখনো মানুষের হস্তগত হয়নি। ভবিষ্যতে হলেও তা দিয়ে সকল মানুষের প্রতিটি কাজ করার সময় মনের অবস্থা কী ছিলো, তা নিরীক্ষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। আর তাই মানুষ রচিত আইনে বিচারের সময় মনের অবস্থা সঠিকভাবে যাচাই করে সুবিচার করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না এবং ভবিষ্যত হবেও না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের সময় মানুষের আইনের মনের অবস্থা পর্যালোচনা করে সুবিচার করার ব্যাপারে দুর্বলতা থাকলেও চূড়ান্ত বিচারের সময় ঐ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা থাকবে না। কারণ ঐ বিচারের সময় প্রতিটি কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিলো, তাও নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। আর প্রতিটি কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থা কুরআনের আইনের প্রণেতা যে নিরীক্ষণ করাচ্ছেন বা করেছেন, তা জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

তথ্য-১

❑ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

অর্থ: পৃথিবী ও মহাকাশের প্রত্যেকটি বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর (কুরআনের আইনের প্রণেতার) জ্ঞান আছে। তোমাদের প্রকাশ্যে বা গোপনে করা সকল কাজই তিনি জানেন এবং (প্রতিটি কাজের সময়) তোমাদের মনের অবস্থাও তিনি জানেন। (তাগাবুন : ৪)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা, এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান তাঁর আছে। আর মানুষের প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কাজ তিনি জানেন বা জানতে পারেন এবং প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিলো তাও তিনি জানেন (নিরীক্ষণ করেন বা নিরীক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন)।

তথ্য-২

পূর্বে উল্লিখিত সূরা ইনফিতারের ১০-১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সম্মানিত নিরীক্ষক ফেরেশতারা প্রতিটি মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ডের সব কিছুই নিরীক্ষণ করেছেন। অর্থাৎ তারা যেমন নিরীক্ষণ করছেন প্রতিটি কাজের বাহ্যিক অবস্থা। তেমনই নিরীক্ষণ করছেন ঐ সময়ের মনের অবস্থা।

তথ্য-৩

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

অর্থ: তোমার রব (কুরআনের আইনের প্রণেতা) এই লোকেরা যা কিছু মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, আর যা কিছু প্রকাশ করে তার সবই জানতে পারেন বা জানেন (নিরীক্ষণ করেন)। (সূরা নমল : ৭৪)

❑❑ এভাবে কুরআনের আরো অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে, সকল কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থাও আল্লাহ নিরীক্ষণ করাচ্ছেন বা করছেন।

তাহলে মনের অবস্থা (Motive) নিরীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষ রচিত আইন যুক্তিসঙ্গত নয় কিন্তু কুরআনের আইন যুক্তিসঙ্গত।

গ. নিরীক্ষণের বাস্তব পদ্ধতি নিখুঁত হওয়া

নিরীক্ষণের বাস্তব পদ্ধতি হতে হবে এমন যে, বিচারের সময় তা পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং তা দেখে যে ব্যক্তি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থাকবে তার এ কথা বলার কোনো সুযোগ না থাকে যে, কাজটি সে করেনি বা কথাটি সে বলেনি। নিরীক্ষিত বিষয়টি কোনো কিছুতে লিখে রাখে এবং সে লেখা উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে বা সাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসা হলে, ঐ দুটো শর্ত ১০০% পূরণ নাও হতে পারে। অর্থাৎ বিচারক সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চয়তা নাও পেতে পারেন বা অপরাধী ব্যক্তি লিখে রাখা বা সাক্ষীর উপস্থাপন করা তথ্যটি সত্য নয় বলে দাবি করতে পারে।

মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী নিরীক্ষণের যে পদ্ধতি উপরোক্ত দুটো শর্ত ১০০% পূরণ করতে পারবে তা হচ্ছে, ভিডিও (VIDEO) নিরীক্ষণ পদ্ধতি। অর্থাৎ ঐ শর্ত পূরণ করে বিচার করতে হলে প্রতিটি মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও'র মাধ্যমে রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং বিচারের সময় সেই ভিডিও রেকর্ড পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তাহলে বিচারক

www.pathagar.com

যেমন ১০০% নিশ্চয়তাসহকারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন, তেমনি অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে কাজটি করেনি বলে টুশব্দটি করারও অবকাশ থাকবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানুষ রচিত আইন

পৃথিবীর সরকারের কোনো সংস্থার পক্ষে সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে প্রথম স্তরের (দুনিয়ার) বিচারের জন্যেও সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানেও নিরীক্ষণকারীরা হবে মানুষ। কিন্তু কুরআনের আইনের চূড়ান্ত বিচারের জন্যে সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড যে ভিডিও (Video) রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে, তা কুরআনের আইনের প্রণেতা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

পূর্বে উল্লিখিত সূরা ইনফিতারের ১০-১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, মানুষের জন্যে (২৪ ঘণ্টার জন্যে) পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে। তারা হচ্ছে, সম্মানিত লেখক। এ কথাটি ব্যাখ্যা করে পূর্বের তাফসীরকারকরা লিখেছেন, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ফেরেশতারা লিখে রাখবেন। ঐ লেখা 'আমলনামা' পরকালে মানুষকে পড়তে দেয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। মানব সভ্যতার পূর্বের জ্ঞান অনুযায়ী লেখা শব্দটার একমাত্র অর্থ হতো কলমের সাহায্যে কোনো কিছুর ওপর হাত দ্বারা লেখা। তাই পূর্বের তাফসীরকারকদের করা আয়াতসমূহের ঐ ব্যাখ্যা তখন সঠিক ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি- পিন (Pin), আলোক রশ্মি (Light ray), লেজার রশ্মি (Laser ray) বা শব্দের প্রকম্পনের (Sound wave) মাধ্যমে ভিডিও টেপ (Video tape), কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) ইত্যাদির ওপর দাগ (Impression) কাটা বা রেকর্ড করাও এক ধরনের লেখা।

তাই মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আয়াত ক'টির অর্থ হবে, 'সকল মানুষের জন্যে পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছেন। সে সম্মানিত রেকর্ডকারীগণ মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও (Video record) করছেন। কুরআনের নিম্নের বক্তব্য দু'টি এ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করে–

ক.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ج وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

www.pathagar.com

অর্থ: আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং মনে মনে যে কুচিন্তা সে করে তা আমি জানি (জানতে পারি)। আমি তার ঘাড়ের শিরা থেকেও বেশি নিকটবর্তী। দু'জন (রেকর্ড) সংগ্রাহক ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের ডান ও বাম পাশে সর্বদা অবস্থান করে। মানুষের সকল কথাই তারা সংরক্ষণ করে। (সূরা ক্বাফ : ১৬-১৮)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে প্রথমে বলেছেন, মানুষের মনের কথা তিনি জানেন বা জানতে পারেন। তারপর তিনি বলেছেন, তিনি সর্বক্ষণ মানুষের চতুর্পার্শ্বে অতি নিকটবর্তী অবস্থানে আছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, দু'জন ফেরেশতা মানুষের সাথে সর্বদা থাকেন এবং তারা মানুষের সকল কথা সংরক্ষণ করেন।

লক্ষণীয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি কী হবে, নির্দিষ্ট করে না বলে তা উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। সুতরাং মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়, সেই সংরক্ষণ পদ্ধতি হবে ভিডিও রেকর্ডিং। কারণ আল্লাহ নিশ্চয়ই সব থেকে ভালো পদ্ধতিতেই রেকর্ড সংগ্রহ করবেন। আর লেখা থেকে ভিডিও রেকর্ডিং যে অনেক অনেক উন্নত পদ্ধতি, তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

খ.

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অর্থ: সে দিন (চূড়ান্ত বিচারের দিন) মানুষকে দলে দলে হাজির করা হবে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্যে। অতঃপর কেউ বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (যিলযাল : ৬, ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: আয়াত ক'টিতে কুরআনের আইনের প্রণেতা পড়তে দেয়া হবে, পড়ে শুনানো হবে বা শুধু শুনানো হবে এমন কথা না বলে 'দেখানো হবে' বা 'দেখতে পাবে' কথা দুটো ব্যবহার করেছেন। তাই উপরে বর্ণিত সূরা ইনফিতারের ১০-১২ এবং সূরা কাফের ১৬-১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে এ আয়াত তিনটির বক্তব্য সমন্বয় করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, কুরআনের আইনের প্রণেতা বলেছেন যে, মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কাজ তাঁর গোয়েন্দা কর্মচারীরা ভিডিও'র মাধ্যমে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করছেন এবং চূড়ান্ত বিচারের দিন ঐ ভিডিও রেকর্ড সকলকে দেখানো হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন ১০০% যুক্তিসঙ্গত কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা নয়।

www.pathagar.com

ঘ. ফলাফল চালু থাকা বিষয়গুলোকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা

যে সকল কাজের ফলাফল চলতে থাকে, যেমন- লিখিত ভাল বা খারাপ বই, তৈরি করা মসজিদ বা জুয়ার ঘর (Casino) ইত্যাদি, সে সব কাজের জন্যে কাউকে পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে– যতদিন ঐ কাজ বা ঐ বিষয়টা চলতে থাকবে, ততদিনের ফলাফলকে হিসাবে আনতে হবে। তা না হলে পরিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে না। আর এ জন্যে দরকার ঐ ধরনের কাজের বা বিষয়ের ফলাফল ততদিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা যতদিন পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। অর্থাৎ ঐ ধরনের সকল কাজের নিরীক্ষণ দরকার হবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এটি করতে হলে যে সত্তা নিরীক্ষণ করবে, তাকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময়ে এবং পরেও তাকে এবং তার নিরীক্ষণের রেকর্ড অক্ষত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থান হচ্ছে–

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে যে সরকার এবং যে কর্মচারীরা নিরীক্ষণ করবে, তারা উভয়েই মরণশীল বা ক্ষণস্থায়ী এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে তার বা তাদের নিরীক্ষণ ধারণকারী বস্তুটিও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মানুষ রচিত আইনে এ শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে সাময়িক (দুনিয়ার) বিচারের জন্যে যারা নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে তারা মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের জন্যে নিরীক্ষণের দায়িত্বে যারা নিযুক্ত আছেন তারা ফেরেশতা। আর ফেরেশতারা পৃথিবী ধ্বংসের সময় (কিয়ামতের সময়) ও ধ্বংস হওয়ার পরও বেঁচে থাকবেন। ঐ নিরীক্ষকদের পক্ষে তাই ফল চলতে থাকা কাজ বা বিষয়গুলোর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফলাফলের নিরীক্ষণ করা এবং তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

তাই কুরআনের আইন, যুক্তিসঙ্গত হওয়ার এ শর্তটিও পূর্ণ করতে পারবে কিন্তু মানুষ রচিত আইনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

১৩. বিচার ব্যবস্থার উপস্থিতি ও স্তর

নিখুঁত হলেই শুধু একটি আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর হয়ে যায় না এবং সবাই তা অনুসরণও করবে না। এর জন্যে থাকতে হবে একটি নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা। আর বিচার নিখুঁত ও পরিপূর্ণ হতে হলে তা হতে হবে দুই স্তরে। যথা-

ক. সাময়িক স্তর এবং

খ. চূড়ান্ত স্তর।

www.pathagar.com

সাময়িক স্তর

এ স্তরের বিচার হতে হবে দুনিয়ায় একজন মানুষের জীবদ্দশায়। আর এ স্তর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন এ জন্যে যে–

ক. এটি না থাকলে যারা চূড়ান্ত বিচারে বিশ্বাস করে না বা করবে না, তারা আইন মানতে চাইবে না। ফলে তারা আইন অমান্য করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

খ. চূড়ান্ত বিচার কতোদিন বা কত শত বছর পরে হবে, তা মানুষ জানে না। বিচার দেরি হলে সে বিচারের প্রভাব (Effect) মানুষের উপর তেমন পড়ে না। তাই তো আমরা জানি ও মানি, 'বিচার বিলম্বিত করা বিচার অস্বীকার করার নামান্তর' (Justice delayed justice denied)।

চূড়ান্ত বিচার

এ বিচার হবে পরকালে অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস (কিয়ামত) হয়ে যাওয়ার পর। পূর্বে উল্লিখিত ও পরে আসা সকল বিষয় পূরণ করে নিখুঁত বিচার দুনিয়ায় করা সম্ভব নয়। তাইতো দুনিয়ার বিচারে দেখা যায়-

- ❑ বহু মানুষ সৎ পথে থেকে জীবন পরিচালনা করার জন্যে অনেক কষ্টসহকারে জীবন-যাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ সততার জন্যে কোনো পুরস্কার না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
- ❑ অনেক মানুষ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদিসহ অত্যন্ত দাপটের সাথে শান্তিতে জীবন-যাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ অসৎ কাজের জন্যে শাস্তি না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
- ❑ যথাযথ সাক্ষী-প্রমাণ বা তথ্য না থাকার দরুন অনেক অপরাধীর শাস্তি হয় না বা হলেও কম হয়।
- ❑ ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীর জন্যে অনেক নির্দোষ মানুষের শাস্তি হয় বা বেশি শাস্তি হয়।

তাই চূড়ান্ত তথা পরকালীন বিচার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হল–

- ❑ দুনিয়ার বিচারে যারা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে তাদের ইনসাফসহকারে যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া।
- ❑ যে সকল কাজের ফল চলতে থাকে (আমলে জারিয়া) তার পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া।

বিচার ব্যবস্থার স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হল উভয় আইনে সাময়িক তথা দুনিয়ার স্তর আছে কিন্তু মানুষ রচিত আইনে চূড়ান্ত তথা

www.pathagar.com

পরকালিন স্তর নেই। আর এই পরকালীন বিচার সম্বন্ধে কুরআনের আইন প্রণেতার অসংখ্যা বক্তব্যের দুটি হল–

❑ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ: যারা অন্যায় (পাপ) কাজ করে তারা কি মনে করে, আমার (বিচার) থেকে তারা বেঁচে যাবে? এটি তাদের ভুল ফায়সালা। (আনকাবুত : ৪)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন, দুনিয়ায় যারা অন্যায় পাপ কাজ করছে তাদের এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, আমি তাদের ধরতে পারব না। দুনিয়ায় আমার আইনে মানুষ বিচারকের দেয়া শাস্তি থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে বেঁচে যেতে পারলেও চূড়ান্ত বিচারের দিন তারা কোনো মতেই বাঁচতে পারবে না। আমার গোয়েন্দারা তাদের বিন্দু পরিমাণ পাপ কাজও ভিডিও রেকর্ড করে রাখছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন আমি তা পর্যালোচনা করে তাদেরকে যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে শাস্তি দিবো।

❑ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ

অর্থ: তোমাদের মনের কথা (দুনিয়ায়) প্রকাশ করে বা নাই থাক, আল্লাহ (চূড়ান্ত বিচারের সময়) অবশ্যই তা বিবেচনায় আনবেন। অতঃপর (ঐ পর্যালোচনার ভিত্তিতে) যাকে ইচ্ছা (যাকে তিনি কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালার ভিত্তিতে নির্দোষ পাবেন তাকে) মাফ করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা (যাকে তিনি কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালার ভিত্তিতে দোষী পাবেন তাকে) শাস্তি দিবেন। (বাকারা : ২৮৪)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, দুনিয়ায় কোনো কাজ করার সময় তোমাদের (মানুষের) মনের অবস্থা (Motive) কী ছিল আমার গোয়েন্দারা (ফেরেশতা) তা সবই রেকর্ড করে রাখছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন আমি ঐ সকল রেকর্ড পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত পুরস্কার ও শাস্তি দিবো। এর ফলে আমার আইনে দুনিয়ার বিচারের সময় প্রকৃত কাজের (Actual action) সঙ্গে মনের অবস্থা (Motive) পর্যালোচনা করে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে যে ত্রুটিগুলো রয়ে গিয়েছিল বা হয়ে গিয়েছিল, তা শুধরিয়ে সকলের জন্যে সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে চূড়ান্ত পুরস্কার ও শাস্তি দিবো। আর এই বিচার করব আমি নিজেই। তাই এ বিচারের সময় আমার আইনে দুনিয়ার বিচারের সময়, বিচারক মানুষ হওয়ায় (তাদের স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতার জন্যে) যদি কোনো অবিচার হয়ে যেয়েও থাকে, তবে তা শুধরিয়ে দিবো।

www.pathagar.com

১৪. বিচারকের বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ততা

বিচার নিখুঁত হতে হলে বিচারককে অত্যন্ত বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ত হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী উভয় আইনের অবস্থান হল—

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে বিচার হবে এক স্তরে তথা শুধু দুনিয়ায় এবং বিচারক হয় মানুষ। কোন মানুষ ১০০% বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সকল প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না। তাই বিচারে কম-বেশি দুর্বলতা সকল ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার স্তরের বিচারের বিচারক থাকবেন মানুষ। তাই সেখানে মানুষ রচিত আইনের মত দুর্বলতা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। কারণ এখানে যিনি বিচারক হবেন তিনি তার বিচার কার্যের ব্যাপারে পরকালে জবাবদিহি করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন। এরপরও সেখানে যে দুর্বলতা থাকবে তা চূড়ান্ত বিচার তথা পরকালীন বিচারে শুদ্ধ করে দেয়া হবে। কারণ ঐ বিচারের বিচারক হবেন স্বয়ং মহান আল্লাহ, যিনি ১০০% বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হবেন।

১৫. জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা বিচারের সময় বিবেচনায় আনা

আইন জানতে ও মানতে সুবিধা হয় এমন সুযোগ সুবিধা যদি কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে বেশী বা কম পেয়ে থাকে তবে আইন মানা বা না মানার কারণে বিচার করে পুরষ্কার বা শাস্তি দেয়ার সময় সেটি বিবেচনায় আনতে হবে। তা না আনলে ঐ বিচার ন্যায়বিচার হবে না। কারণ জন্মের স্থান ও কালের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হলো—

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে এটি সাধারণত বিবেচনায় আনা হয় না। সেখানে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি অধিক বিলাসবহুল জীবনযাপন করার জন্যে চুরী করলে যে শাস্তি, গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি পেটের দায়ে চুরি করলেও একই শাস্তি।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়া ও পরকাল, উভয় স্থানে বিচারেই এটি বিবেচনা করা হবে। যেমন কুরআনের আইনে দুনিয়ায় ধনীরঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে জন্মসূত্রে ধনী হওয়া ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কাটা হবে কিন্তু গরীবের ঘরে জন্ম হওয়ার কারণে গরীব হওয়া ব্যক্তি পেটের দায়ে চুরি করলে তার কোন শাস্তি নেই। তবে দুনিয়ার বিচারের তথ্যের দুর্বলতা এবং বিচারকের বিচক্ষণতার

www.pathagar.com

অভাবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবার ব্যাপারে সুবিচার করা সাধারণত সম্ভব হয় না। কিন্তু চূড়ান্ত বা পরকালের বিচারে এ বিষয়টি নিখুঁতভাবে বিবেচনায় এনে সকলকে চূড়ান্ত পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। এ কথাটিই কুরআনের আইনের প্রণেতা নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

অর্থ: তিনি তোমাদের পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে অন্যজনের তুলনায় (জন্মগতভাবে) কোন কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তা বিবেচনায় এনে যাচাই করতে (পরীক্ষা নিতে) পারেন। (আন'আম : ১৬৫)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে জানিয়েছেন জন্মগত কারণে কোন ব্যক্তি ইসলাম জানা ও মানার ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা বেশি বা কম পেয়ে থাকলে পরকালের বিচারে তিনি তা বিবেচনায় এনেই পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন। কারণ যে ব্যক্তি মুসলিম পরিবারে, আরব দেশে, ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী পরিবারে বা ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তার ইসলাম জানা ও অনুসরণ করা ঐ ব্যক্তির তুলনায় অনেক সহজ যে অমুসলিম পরিবারে, অনারব দেশে, ইসলামের জ্ঞান না থাকা পরিবারে বা গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে।

তথ্য-২. ক

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

অর্থ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোন বার্তাবাহক (হক ও বাতিল জানানোর জন্যে) তার নিকট পাঠাই। (বনী-ইসরাইল:১৫

তথ্য-২.খ

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرِيْنَ.

অর্থ: আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (শু'য়ারা:২০৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা এ দুখানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছিয়ে তিনি কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে শাস্তি দেন না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন জন্মগত কারণে যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী ইসলাম জানতে পারেনি এবং জন্মের স্থানের কারণে যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী ইসলাম সহজে জানতে পেরেছে, পরকালে এ উভয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার মানদণ্ড ভিন্ন হবে। প্রথম গ্রুপের মানদণ্ড অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

www.pathagar.com

১৬. ওকালতি ও সাক্ষী প্রথায় উপস্থিতি ও ধরন

ওকালতি ও সাক্ষী প্রথা উভয় আইনেই আছে। তবে তার ধরন ও ব্যাপ্তিতে পার্থক্য আছে। তাই চলুন এখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের দুই স্তরের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য পর্যালোচনা করা যাক–

দুনিয়ার বিচার

মানুষ রচিত আইনের ওকালতি প্রথায় দেখা যায় একজন উকিল মক্কেলকে অপরাধী জেনেও তার যাতে মোটেই বা যথাযথ শাস্তি না হয়, সে ব্যাপারে বিচারককে বিভ্রান্ত করার জন্যে নানা ধরনের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারক এভাবে বিভ্রান্ত হয়েও যায়। আবার সাক্ষীরাও নিজ স্বার্থে নানা ধরনের মিথ্যা সাক্ষী দিয়েও বিচারককে ন্যায়বিচার করা থেকে বিভ্রান্ত করে।

কুরআনের আইনে উকিল ও সাক্ষীদেরকে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকতে বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকতে এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়াকে কঠোর ভাষায়, নানাভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনের কয়েকটি বক্তব্য হচ্ছে–

وَلاَ تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না। (সূরা বাকারা : ৪২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে উকিল (Advocate) ও সাক্ষীদেরকে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী দিতে এবং জানা থাকা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। কুরআনের অন্য জায়গায় এ কাজের জন্যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, ন্যায়ের ধারক হও এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে সাক্ষী হও। তোমাদের এই ন্যায়পরায়ণতা ও সত্য সাক্ষ্যের ফল তোমাদের নিজেদের উপর বা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর পড়ুক বা পক্ষদ্বয় ধনী বা গরীব যাই হোক না কেন, (মনে রাখবে, তাদের সকলের সন্তুষ্টির চেয়ে) আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেই তোমাদের বেশি খেয়াল রাখতে হবে। অতএব নিজেদের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) দাবি পরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা থেকে কখনো দূরে থাকবে না। (আমার এ নির্দেশ উপেক্ষা করে) তোমরা যদি অন্য কারো মান রাখার জন্যে কথা বলো, সাক্ষী দাও অথবা সত্য বলা থেকে দূরে থাক– তবে জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু কর, বল বা সাক্ষী দাও– আল্লাহ সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন (এবং চূড়ান্ত বিচারের দিন তার জন্যে যথাযথ পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে)। (নিসা : ১৩৫)

❑❑ তাই কুরআনের আইনে, এক ব্যক্তি অপরাধ করেছে তা জানা বা বুঝা সত্ত্বেও ওকালতি বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও একটি বড় অপরাধ। এ অপরাধ প্রমাণিত হলে উকিল বা সাক্ষীদের দুনিয়াতেই শাস্তি পেতে হবে। আর দুনিয়ার শাস্তি থেকে কোন মতে রেহাই পেয়ে গেলেও পরকালের শাস্তি থেকে তারা কোনোমতেই রেহাই পাবে না। এ জন্যে দুনিয়ার বিচারে কুরআনের আইনের ওকালতি ও সাক্ষ্য ব্যবস্থা, বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে, মানুষ রচিত আইনের তুলনায় বেশি সহায়ক হবে।

পরকালিন বিচার

মানুষ রচিত আইনে পরকালীন বিচার নেই। তাই এ আইনে পরকালীন বিচারের ওকালতি বা সাক্ষীর ব্যবস্থা থাকা না থাকার কোন প্রশ্ন আসে না।

কুরআনের আইনে পরকালীন বিচার আছে এবং সেখানে ওকালতি থাকবে। পরকালীন বিচারের ঐ ওকালতির নাম হবে শাফায়াত। সে শাফায়াতের যে নিয়ম-কানুন হবে তা হল–

❑ শাফায়ত করার যোগ্যতা

প্রথমে শাফায়াতকারীকে শাফায়াত করার জন্যে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি নেয়ার প্রথার উপস্থিতি বলে দেয় সবাই অনুমতি পাবে না। অনুমতি পাবে নবী-রাসূলগণ ও অতিউচ্চ মানের (মুহসিন মানের) নেক্কার মু'মিনগণ।

❑ শাফায়াত পাওয়ার যোগ্যতা

শাফায়াতের দ্বারা সকল গুনাহগারকে মাফ করা হবে না। ছগীরা ও মধ্যম (না ছগীরা ও না কবীরা) ধরনের গুনাহগাররা শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পাবে। কবীরা গুনাহগাররা শাফাতের মাধ্যমে মাফ পাবে না।

(শাফায়াতের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে-'কুরআন, হাদীস ও বিবেকে-বুদ্ধি অনুযায়ী শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? নামক বইটিতে)

www.pathagar.com

১৭. দুনিয়ার বিচারে শাস্তির উপস্থিতি ও ধরন

আইন অমান্য করার জন্যে শাস্তির বিধান সকল আইনে আছে। শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য দুটো–

১. অন্য মানুষ যেন সন্দেহাতীতভাবে জানতে ও বুঝতে পারে যে, ঐ ধরনের অপরাধ করলে কী রকম শাস্তি হয়। আর এর ফলস্বরূপ আশা করা হয় বা আশা করা যায়, অন্য মানুষ ঐ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

২. যে শাস্তি পেল সে যাতে আর ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

শাস্তি দেয়ার এ দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। কারণ–

ক. যে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেলো সে তো পুনর্বার ঐ অপরাধ করার সুযোগই পায় না।

খ. যে শাস্তি পেলো সে তো একজন ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু ঐ অপরাধ করার মতো অসংখ্য ব্যক্তি সমাজে থাকতে পারে বা থাকে। তাদেরকে ঐ অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারলে সমাজের অধিক কল্যাণ হবে।

দুনিয়ার বিচারে শাস্তি দেয়ার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ঐ দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হতে হলে, সে শাস্তিকে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

ক. শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঠিক করার সময় অপরাধী ব্যক্তির প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখানোর চেয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ অপরাধীর প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখাতে গেলে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ হয়ে যাবে এমন যা অন্যদের বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ করা থেকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ অপরাধীর প্রতি দয়া দেখানোর অর্থ হচ্ছে অনেক নিরপরাধ মানুষের শাস্তির ব্যবস্থা করা। এর ফলে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

খ. শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক। তা না হলে ঐ শাস্তি দেখে মানুষ ভীত হবে না। আর তাই ঐ শাস্তি অন্য মানুষকে ঐ অপরাধ করতে বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ আবার করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এর ফলেও শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

গ. শাস্তি হতে হবে জনসমক্ষে, যাতে হাজার হাজার বা কোটি কোটি মানুষ তা নিজ চক্ষে দেখতে পায়। কারণ নিজ চক্ষে দেখলে শাস্তির ধরনটি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় এবং মনের উপর ঐ শাস্তির যে প্রভাব পড়ে তার প্রচণ্ডতা, শাস্তির কথা পড়া বা শুনার মাধ্যমে জানার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হয়।

www.pathagar.com

ঘ. সচরাচর ঘটা অপরাধের শাস্তি এমন হলে ভালো হয় যেন অপরাধী ব্যক্তিকে দেখলেই বুঝা যায় তাকে ঐ নির্দিষ্ট অপরাধের জন্যে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সকল সময় উন্মুক্ত থাকে অর্থাৎ সকল সময় দেখা যায়, শরীরের এমন কোনো অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে শাস্তি দিলে, তা শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এবার চলুন শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতির উপরোক্ত সাধারণ বিবেক-সিদ্ধ দৃষ্টিকোণের আলোকে মানুষ রচিত আইন ও কুরআনের আইনের দুনিয়ার বিচারকে পর্যালোচনা করা যাক–

মানুষ রচিত আইন

শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি স্থির করার সময় মানুষ রচিত আইনে অপরাধীর সম্মান, মর্যাদা, কষ্ট, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়। এর ফলস্বরূপ মানুষের আইনে-

ক. অধিকাংশ শাস্তি লঘু হয় বা দৃষ্টান্তমূলক হয় না,

খ. শাস্তি কার্যকর করা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারের মধ্যে,

গ. সকল সময় উন্মুক্ত থাকে এমন কোন অঙ্গ স্থায়ীভাবে বিকৃত করে শাস্তি দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

তাই মানুষ রচিত আইনের শাস্তি তার উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ অপরাধ ঘটনের মাত্রা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। আর এর ফলে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় বা তাদের শান্তি, সম্মান, মর্যাদা ও মানবাধিকার বেশি লঙ্ঘিত হয়। এটা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর আইনে দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের সময় নিরপরাধ সাধারণ মানুষের শাস্তি, কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অপরাধীর কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সেখানে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিবেক-বুদ্ধির সকল শর্ত সুনিপুণভাবে পূরণ করেছে। আল কুরআনে বর্ণিত শাস্তির সেই ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতির কয়েকটি হচ্ছে-

ক. কুরআনের আইনের প্রণেতা অপরাধের শাস্তি, মানুষের সামনে অর্থাৎ প্রকাশ্যে দিতে বলেছেন। এটা তিনি সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অবিবাহিত লোকদের জেনা করার জন্য শাস্তি দেয়ার প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে, সূরা নূরের ২ নং আয়াতে। আয়াতটি হচ্ছে–

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ আর তাদের শাস্তি দেয়ার সময় ঈমানদারদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে। যাতে হাজার হাজার, লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষ তা দেখতে পায়। কারণ শাস্তি দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আর সে প্রতিবন্ধকতা সব থেকে বেশি গড়ে ওঠে নিজ চক্ষে শাস্তিটি দেখলে।

খ. কুরআনের আইন প্রণেতা শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দৃষ্টান্ত মূলকভাবে। যেমন–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.

অর্থঃ তাদের প্রতি (তাওরাতে ইয়াহুদীদের প্রতি) আমি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্যে সমান শাস্তি নির্দিষ্ট। (মায়েদা : ৪৫)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে বলেছেন, কুরআনের ন্যায় তাওরাতেও আমি (ইয়াহুদীদের জন্যে) অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্যে লিখে দিয়েছিলাম যে, কেউ যদি অন্যায় করে কাউকে হত্যা করে, কারো চোখ উঠিয়ে ফেলে, কারো কান কেটে দেয়, কারো দাঁত ভেঙে দেয় বা কাউকে যখম করে তবে সরকারিভাবে (ব্যক্তিগতভাবে নয়) বিচার করে তাকেও যথাক্রমে হত্যা করতে, চোখ উঠিয়ে ফেলতে, কান কেটে দিতে, দাঁত ভেঙে দিতে বা সমপরিমাণ যখম করতে হবে।

গ. কুরআনের আইন প্রণেতা সচরাচর বা বেশি ঘটা অপরাধের শাস্তি দিতে বলেছেন, সহজে দেখা যায়, এমন অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে। যেমন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

www.pathagar.com

অর্থঃ চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া শিক্ষামূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী এবং তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। (মায়েদা : ৩৮)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে চুরির শাস্তি হিসেবে পুরুষ ও মহিলা উভয় চোরেরই হাত কেটে দিতে বলেছেন। এই শাস্তির প্রয়োগের ব্যাপারে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামদের কর্মনীতি পর্যালোচনা করলে চূড়ান্তভাবে যে তথ্য বের হয়ে আসে। তা হচ্ছে– শুধু ধনী চোরদের এ শাস্তি দিতে হবে। গরিব চোর যারা অভাবে পড়ে চুরি করে তাদের এ শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং অভাবে পড়ে কেন তাকে চুরি করতে হলো সে জন্যে তাদের শাসককে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, এ শাস্তি একটি শিক্ষামূলক শাস্তি। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটি তিনি চোর ও অন্য মানুষদের এ শিক্ষাটি প্রদানের জন্যে দিয়েছেন যে, বিশেষ অভাব ছাড়া চুরি করলে তাকে নিশ্চিতভাবে এ ধরনের শাস্তিই পেতে হবে। আর একজন চোরের শাস্তি স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে সকলে যাতে এ শিক্ষাটি পেতে পারে, সে জন্যে সহজে দেখা যায় এমন একটি অঙ্গের স্থায়ী অঙ্গ বিকৃতি করে এ শাস্তি দেয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। চোরটি যতো দিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন অসংখ্য মানুষ তাকে দেখে এ বাস্তব শিক্ষাটি পেতে থাকবে।

সুধী পাঠক, তাহলে দেখা যাচ্ছে কুরআনের আইন দুনিয়ার বিচারে শাস্তির যে ধরন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ণয় করে দিয়েছে, তা শাস্তি দেয়ার বিবেক-বুদ্ধিসম্মত সকল উদ্দেশ্য সুনিপুণভাবে পূরণ করতে পারে।

১৮. শাস্তি থেকে কেউ রেহাই না পায় তার নিশ্চয়তা থাকা

আইন সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে হলে অপরাধ করে কেউ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তা না হলে অপরাধীরা অপরাধ করতে সাহস পাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হল–

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে যেহেতু বিচার হবে এক স্তরে এবং বিচারক ও তথ্য সংগ্রহকারীরা হবে মানুষ তাই সেখানে সকল অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা অসম্ভব।

www.pathagar.com

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের অংশে ঐ দুর্বলতা থাকলেও পরকালীন বিচারের অংশে তা ১০০% পূরণ হয়ে যাবে।

❑❑ তাই এ দৃষ্টিকোণেও কুরআনের আইন অধিক যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর।

১৯. পুরস্কারের উপস্থিতি ও ধরন

আইন মানতে উৎসাহিত করার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা যুক্তিসংগত। আর সে পুরস্কারের মান এমন হওয়া উচিত যেন তার আশায় মানুষ আইন মানতে যেয়ে কিছু কষ্ট হলেও তা স্বীকার করে নিতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান হল-

মানুষ রচিত আইন

মানুষ রচিত আইনে, আইন মানাকে উৎসাহিত করে সকলের জন্যে প্রযোজ্য এমন কোন ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের স্তরে মানুষ রচিত আইনের ন্যায় এ বিষয়ে দুর্বলতা আছে। তবে পরকালীন বিচারে তা পূরণ হয়ে যাবে। যারা দুনিয়ায় কুরআনের আইন মেনে চলবে তাদের জন্যে পরকালের অনন্ত জীবনে অপরূপ পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। ঐ পুরস্কারের আশায় আইন মানার কারণে কষ্ট হলেও তা স্বীকার করে নেয়া স্বাভাবিক। আর অসংখ্য মানুষ ঐ পুরস্কারের আশায় অকল্পনীয় কষ্ট মেনে নিয়েছে এমনকি জীবনও দিয়ে দিয়েছে তার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, উপরের তথ্যগুলো জানার পর আশা করি এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না যে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সকল দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষ রচিত আইন তার ধারে কাছেও নেই। আর কুরআনের আইন যে মানুষের সমাজকে অপূর্বভাবে কল্যাণময় বা শান্তিময় করতে পারে, তার বাস্তব কয়েকটি প্রমাণ হচ্ছে–

ক. রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

রাসূল (সা.) এর মদিনা শরীফে হিজরাতের পর থেকে পৃথিবীতে কুরআনের আইনের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত পৃথিবী কুরআনের আইন পুরোপুরি চালু থাকার সুফল দেখেছে। ঐ সময় মানুষের সমাজ কী অপূর্বভাবে শান্তিময় ছিলো, সবার জানা নিম্নের কয়েকটি তথ্যই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ–

www.pathagar.com

১. রাষ্ট্র প্রধানের (হযরত ওমর রা.) স্বয়ং ঘুরে ঘুরে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা দেখা এবং একজনের ঘরে গম নেই দেখে রাষ্ট্রীয় খাদ্য গুদাম থেকে নিজ পিঠে করে গম বয়ে নিয়ে প্রজার বাড়িতে পৌঁছে দেয়া।

২. সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানকে জনসমক্ষে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা যে, সরকারের দেয়া কাপড় তাদের (নাগরিকদের) তুলনায় অধিক তিনি কোথা থেকে পেলেন? আর রাষ্ট্রপ্রধানের (হজরত ওমর রা.) অসন্তুষ্ট না হয়ে তার সন্তোষজনক উত্তর দেয়া।

৩. তৎকালীন গরিব আরব দেশ কুরআনের আইন চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে এত ধনী হয়ে যাওয়া যে, যাকাত নেয়ার মত গরিব লোক সে দেশে খুঁজে না পাওয়া।

৪. যুদ্ধের ময়দানে আহত ও পিপাসার্ত সৈনিকের পানি পেয়েও নিজে আগে পান না করে অপর সৈনিক ভাইদের আগে পান করাতে বলা এবং নিজে পিপাসায় মৃত্যু বরণ করা।

৫. তৎকালীন পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ ও অসভ্য দেশেও কয়েক বছরের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসা।

খ. বর্তমান বিশ্বের উদাহরণ

বর্তমান বিশ্বের সৌদি আরবে কুরআনের আইনের শুধু কয়েকটি অপরাধের (চুরি, হত্যা ইত্যাদি) শাস্তির পদ্ধতি (প্রকাশ্যে হাত ও গলা কাটা ইত্যাদি) চালু আছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বের সকল তথাকথিত উন্নত দেশের তুলনায় সে দেশে অপরাধের সংখ্যা অনেক অনেক কম।

❑❑ তাই এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, মানুষ যদি অন্তত দুনিয়ায়ও প্রকৃত শান্তি পেতে চায়, তবে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাদের কুরআনের আইনের ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। আর পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষ যারা চায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক অর্থাৎ যারা চায় তারাসহ সমাজের সকলে শান্তিতে থাকুক, তাদের কুরআনের আইনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কালবিলম্ব না করে এগিয়ে আসা উচিত। আর যারা শুধু নিজে শান্তিতে থাকতে চায়, তাদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ সমাজে শান্তি না থাকলে সে একা কোনোভাবেই শান্তিতে থাকতে পারবে না।

সবশেষে সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। সেটি সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে –

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক , বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন এবং কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে

www.pathagar.com